আওয়ামী লীগের রাজনীতি ও আমাদের জাতীয় সংকট সদর রাস্তা

ফরহাদ মজহার

আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য কোন দল যদি ভুল করে তাহলে সেই ক্ষতিটা হয় সেই দলের জন্য ক্ষতি আর আওয়ামী লীগ নিজে যদি ভুল করে তবে সেটা হয় বাংলাদেশের জন্য মহাসর্বনাশের কারণ। (আহমদ ছফার অতি কথিত একটি প্রবাদসম উচ্চারণ)

আমি এই লেখাটি মাননীয় বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনাকে উদ্দেশ করে লিখব। আমার ধারণা, আমি এক কিস্তিতে শেষ করতে পারব না। আমি জানি না তার কাছে এই লেখা পৌঁছবে কিনা। আওয়ামী লীগকে যেসব কর্মী মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসে আমি তাদের চিনি। আমি তাকে নিশ্চিত করে বলতে পারি, তারাও আমাকে চেনে। ঘরে-বাইরে গ্রামেগঞ্জে শহরে-বন্দরে জীবনের দৈনন্দিন সামাজিকতার মধ্যে এই মানুষগুলোর সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি শহরে থাকি না। মানুষের মধ্যেই ঘোরাফেরা করি। এদেরই লাশ আমি পড়ে থাকতে দেখছি একুশে আগস্টের সেই ভয়াবহ গ্রেনেড ও বোমা হামলার পর। কিংবা এর আগের বোমা হামলাতেও। এদেরই ছেঁড়া হাত, ছেঁড়া পা, আঙুলের টুকরা, খসে যাওয়া চোখ, রক্ত, হাড় ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটকে ছিল চারদিকে। চতুর্দিকে মৃত-আহতদের মধ্যে ভয়ে পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো তাদের স্যান্ডেলগুলো ফেলে চলে গেছে। মানুষের লাশ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক তেমনি পরিত্যক্ত জিনিসের মধ্যে পরিত্যক্ত প্রাণের মতোই পড়ে আছে। ঠিক বললাম কি? মানুষ ছিন্নবিচ্ছিন্ন, কিন্তু যারা নাই তারা যে মানুষই ছিল তারই সপ্রাণ চিহ্ন হয়েই তো পায়ের স্যান্ডেল-জুতাগুলো পড়ে ছিল। আমারই যে দুটো মৃত বোনের চেহারা পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তাদের চোখ বোধহয় এই দৃশ্য অনন্তকাল ধরে দেখবে বলেই আর বন্ধ হয়নি। ক্যামেরার দিকেই যেন– নাকি আমাদের দিকেই– তাকিয়ে আছে। দাফন করার সময় কেউ তাদের বলে দিয়েছিল কিনা এই বীভৎসতা অন্তকাল দর্শনের জন্য মানুষের জন্ম হয় নাই, মৃত্যুও না। অতএব চোখ বন্ধ করো। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে দিব্যদৃষ্টির জন্য মানুষের পৃথিবীতে আসা, গ্রেনেড হামলা দেখার জন্য নয়। এই ধরনের ঘটনায় বহু সংবেদনশীল মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পাগল হয়ে যায়। কারণ পৃথিবীতে তথাপি এখনও মানুষ আছে। আমরা তো খোঁজ রাখি না। খোঁজ না রাখলেও লুকিয়ে ছাপিয়ে থাকলেও মানুষ আছে। আছে নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও। মানুষ।

একুশে আগস্টের ঘটনার বর্ণনা আমার উদ্দেশ্য নয়, যদিও এই আঘাত আমি ব্যক্তিগতভাবে এখনও সামাল দিয়ে উঠতে পেরেছি দাবি করতে পারব না। কিন্তু শেখ হাসিনার কাছে একটি মাত্র মিনতি– আপনাকে এটা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে যে আপনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে একটি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। আমার ধারণা আপনাকে হত্যা করে হোক কিংবা আপনার নেতৃত্বকে প্রশ্নবোধক করে তুলে হোক– আপনার পতন ত্বরান্বিত করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আপনি না থাকলে আওয়ামী লীগ থাকবে, যেমন শেখ মুজিবুর রহমান নাই, আওয়ামী লীগ কি নাই? আছে। কিন্তু সেটা শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ। অতএব আপনি নেতৃত্ব দেবেন নাকি পরাজিত ও ব্যর্থ হয়ে ইতিহাসে নিন্দিত থাকবেন, সেই সিদ্ধান্ত একদমই আপনার একার– আপনার একারই সিদ্ধান্ত। সেই কারণে আমার লেখাটিও একদমই আপনার জন্য। কিন্তু এই লেখা খোলা চিঠি ধরনের চমক নয়। আপনার কাছ থেকে ইতিবাচক নেতৃত্বের সম্ভাবনা আছে এই বিশ্বাস যে আমি করি সেটা পাঠকরাও জানুক, যেন তারা আমার বিচার করতে পারে। অন্যদিকে আমার রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে আপনি কিংবা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া– কিংবা শাসক ও শোষক শ্রেণীর অন্যান্য দলের কেউই মিত্র নন, শত্রু। সামাজিক অর্থে শত্রুমিত্র কথাটিকে আমরা যেন আবার রাজনৈতিক শত্রুমিত্রের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। নোয়াখালীতে আমার পরিবার কঠোরভাবে আওয়ামীপন্থী বলে পরিচিত। আমার বাবা মৃত্যুর আগে এই বলে চোখ মুদেছিলেন যে, তিনি কবরে যাওয়ার আগে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় দেখে যেতে পেরেছেন– এই তার শান্তি। আপনি তখন ক্ষমতায় ফিরে এসেছেন। তিনি, আমার পিতা, তাহলে রাজনীতির দিক থেকে আমার সম্পূর্ণ বিরোধী মানুষ। কিন্তু সন্তান হয়ে পিতার সঙ্গে যে প্রেমের সম্পর্ক সেখানে না আমার জনক না আমি কখনও ক্ষয় হতে দিয়েছি। পাঠকরা যদি মনে করেন আমার আওয়ামী-প্রীতি পারিবারিক দোষ, আমার লজ্জিত হওয়ার কিছু নাই। আমি হাওয়ায় বাস করি না। পরিবার, পরিজন, সমাজ, বন্ধু-বান্ধব নিয়েই তো আমি সামনে এগিয়ে যেতে চাই। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে শত্রুমিত্রের প্রশ্নকে কোনভাবেই পারিবারিক, সামাজিক বা অন্য সম্পর্কের সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে ফেললে আমরা না ঘরকা না ঘটকা হয়েই থাকব– এটা শুধু তত্ত্ব থেকে নয়, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝেছি।

আমাদের মতো যারা আওয়ামী লীগ বা বিএনপিকে শাসক ও শোষক শ্রেণীরই প্রতিনিধি মনে করি সেটা অতএব লুকানোর কোন দরকারই নাই, অন্যদিকে এই দলগুলোর যদি কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা থাকে তাহলে তাকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করা এবং সেই ভূমিকা বাস্তবায়নের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করার কাজও আমাদের সুস্পষ্টভাবেই করতে হবে। সমর্থন বা বিরোধিতা দুটোর কোনটিই যেন সুবিধাবাদী বা প্রতিক্রিয়াশীল জায়গা থেকে আমরা না করি। নইলে আমরা এই দেশের মানুষগুলোকে কোনদিনই ঠিক পথ দেখাতে পারব না।

যারা বাংলাদেশে সত্যি সত্যিই সমৃদ্ধি ও শান্তি চান এবং যাদের মধ্যে শত্রুমিত্র ভেদ পরিষ্কার তারা জানেন আমাদের সমাজের রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষা এবং জনগণের সাংগঠনিক শক্তির যে মাত্রা সেই বাস্তবতায় অবিলম্বে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক কোন রূপান্তর ঘটার শর্ত নাই। অভাব, অনটন, সন্ত্রাস, বোমাবাজি ও অপরাপর আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় ক্ষুব্ধ হয়ে পেট কেটে বাচ্চা বের করে আনার মতো একটা বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটিয়ে দেয়ার জন্য অনেকে প্ররোচিত হতে পারে ঠিকই, কিন্তু বাংলাদেশে এমন কোন সচেতন কর্তাসত্তা বা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনৈতিক দলের উপস্থিতি আমরা দেখছি না যাতে এই ধরনের ঘটনা ইতিবাচক হবে। বরং ভ্রূণ এবং জননী উভয়েরই মরে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা। বহু হঠকারি পদক্ষেপ উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিয়েছিলেন, কিন্তু তা নস্যাৎ হয়ে গিয়েছে। যদি সফলও হতো জনগণের রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার অভাবে সেটা হতো কম্বডিয়ার পলপট সরকারের মতোই ভয়াবহ। কিংবা হিটলারের জার্মানি ও মুসোলিনীর ইতালির মতো এক প্রকার বঙ্গদেশীয় ক্যারিকেচার। 'জাতীয় সমাজতন্ত্র' নামক ফ্যাসিবাদী তত্ত্ব আমাদের সমাজে তো এখনও সক্রিয়। রুশ দেশের 'নারোদনিক' মার্কা চিন্তা-ভাবনা, লেনিনকে যাদের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে– আখছারই আমাদের আশপাশেই ঘোরাফিরা করে। মরে নাই। 'সমাজতন্ত্র' বা 'বামপন্থা' নামে যেসব কায়কারবারের চল আছে তার অধিকাংশই বর্তমান সমাজব্যবস্থার বিপরীতে প্রতিক্রিয়া কেবল, অক্ষমের আস্ফালন বা পরাজিতের দীর্ঘশ্বাস। এছাড়া আর কি? এসব রাজনীতি নয়। রাজনৈতিক দলের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে একটা অফিস নিলেই সমাজতন্ত্র কায়েম করা যায় না। 'বিপ্লব' ব্যাপারটা দোকানদারি নয়। একটি জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দিতে হলে সমাজে ধর্ম, সংস্কৃতি বা বামপন্থার ছদ্মবেশে যেসব প্রতিক্রিয়াশীল ধারাগুলো থাকে তার বিরুদ্ধে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন অবস্থান নিতে জানতে হবে আমাদের। প্রায়ই একা, একদমই নিঃসঙ্গ হয়েও আমি এই ধরনের নানান প্রকাশ্য ও চোরাগোপ্তা ধারার বিরুদ্ধে লেখায় ও কাজে সংগ্রাম করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কখনোই কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। অনেক ভুল থাকতে পারে আমার, কিন্তু নিরিখটা কখনও হারাইনি। বাংলাদেশের প্রগতিশীল ধারার মধ্যে এখন অনেক সুবাতাসের লক্ষণ আছে। অনেক ভালবাসার শ্রদ্ধার মানুষ আছেন আমার। লেখালেখি চেঁচামেচি করে সেই ধারা আগলে রাখা এবং শক্তিশালী করাই আমি আমার কাজ বলে মনে করি। অনেকটা ভাদ্র মাসে গ্রামের মেয়েদের

ধানের বীজ শুকিয়ে রাখার কাজ। কারণ বীজ যদি নষ্ট হয়, চাষ হবে কোত্থেকে?

সেই সুবাতাস আগলে রাখা আওয়ামী লীগের কাজ না হতে পারে, ঠিক আছে। সেটা বিএনপি, জাতীয় পার্টি বা জামায়াতে ইসলামীরও কাজ নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু বাংলাদেশের এখনকার কর্তব্যকর্মের সঙ্গে আগলে রাখার কাজের একটা সম্পর্ক আছে। এই দুটি দলের অন্তর্দ্বন্দ্বে বাংলাদেশ ধ্বংস হোক এটা তো আমরা চাইতে পারি না। সত্যি যে শাসক ও শোষক শ্রেণী জনগণের শত্রু। মিত্র নয়। কিন্তু যদি কেউ বলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি বা অন্য কোন দল দিয়ে বাংলাদেশের কোন কিছুই হবে না– তাহলে সেটা হবে ছেলেমানুষী অথবা উন্নাসিকতা। এই কথার পেছনে যে গুহ্য দাবি জাহির হয় সেটা হল আমাদের ক্ষমতায় বসাও। আমরা পারব। না, বামপন্থীরা এখনও পারবে না। কারণ তাদের কর্মসূচি, কাজের পদ্ধতি ছাড়াও দেশ, অঞ্চল এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতির হুঁশ অতি অপ্রতুল। তাছাড়া বর্তমান বাংলাদেশের বাস্তবতায় তারা কি ধরনের আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করত চান, সেটা কোথায় আওয়ামী লীগ বা বিএনপি থেকে আলাদা বা সেটা কেন আওয়ামী লীগ বা বিএনপি পারবে না, একমাত্র তারাই পারবেন, সেসব আমার কাছে পরিষ্কার নয়। তাদের স্লোগান আছে। ভাল। কিন্তু নিজস্ব– অর্থাৎ গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য উপযোগী কোন কর্মসূচি নাই। ফুলস্টপ।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এবং রাজনৈতিক কর্তাসত্তার অভাবে আমি মনে করি ক্ষমতাসীন বা ক্ষমতাবহির্ভূত দলগুলোর একটি ভূমিকা আছে। গণতান্ত্রিক না হলেও সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিও যদি আমরা কিছুটা চর্চা করতে পারি তাহলে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কাজ আমরা গুছিয়ে নেয়ার সময় পাব। এদিক থেকেই আমি মনে করি শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া উভয়ের কারোরই বাংলাদেশে ইতিবাচক ভূমিকা পালনের সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়ে যায় নাই। এই কথাটা পরিষ্কারভাবেই বলা দরকার। যদি আমরা দুটো দলের নেতৃত্বাধীন ধারাকে সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পথে রাজনীতি করতে বাধ্য না করি তাহলে বাংলাদেশ অতি অনায়াসে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা গোষ্ঠীর গ্রেনেড ও বোমা নিয়ে খেলার মাঠে পরিণত হবে। আমরা তা হতে দিতে পারি না।

এই অবস্থান থেকেই আমি মনে করি সংসদকেই হতে হবে অবিলম্বে আমাদের রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। রাজপথও নয়, অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ও নয়। কারণ রাষ্ট্রের নির্দলীয় ও সার্বভৌম অভিপ্রকাশ একমাত্র সংসদ। হতে পারে পার্লামেন্ট অতি অকার্যকর এবং সাংবিধানিক দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু আমাদের হাতে আর কোন রাজনৈতিক সংস্থা নাই যেখানে আমরা একটা মধ্যবর্তী জায়গায় দাঁড়িয়ে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার কাছে নিয়ে আসতে পারি। আমরা সারাক্ষণই আওয়ামী লীগকে বিরোধী দল বলে ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা করি এবং ক্ষমতাসীন দলের বিরোধিতাই বিরোধী দলের ভূমিকা– এরকম একটা বিকৃত ধারণা পোষণ করে থাকি। সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির জন্য এই ক্রমাগত প্রচার অতিশয় ক্ষতিকর। রাজনৈতিক দলগুলো রাষ্ট্রেরই অংশ– কারণ তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার চর্চা ও বিকাশের একমাত্র প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের শক্তি ও রাষ্ট্র কাঠামো উভয় নিয়েই রাষ্ট্র। অতএব জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ যখন বসে তখন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদেরই অধীন। তিনি তখন আর প্রধানমন্ত্রী নন– তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতীয় সংসদে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

এই জবাবদিহিতার দায় থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্তি দিতে পারি না। বিএনপিকে নিরপরাধ বলে কূটতর্ক করাও আমার ধারণা সময়ের অপচয়। না আমরা সেই বাজে তর্ক করব না। সেটা হবে জঘন্য জাতীয় অপরাধ। নাগরিক হিসেবে আমরা জানি যে একুশে আগস্টে গ্রেনেড ও বোমা হামলা হয়েছে। এই ভয়াবহ হামলার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব অবশ্যই ক্ষমতাসীন জোট সরকারকে বহন করতে হবে। এটা সংবিধান, নিয়ম ও নীতির কথা।

যদি এই ন্যূনতম নীতিটা আমরা কার্যকর করতে চাই তাহলে সংসদে আওয়ামী লীগ যা খুশি বলুক সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা মহাঅপরাধ। আওয়ামী লীগের ক্ষোভ, বিক্ষোভ, হতাশা, ক্রুদ্ধতা সবকিছুকেই সহনশীলভাবে গ্রহণ এবং তাকে সেই কথা বলতে দেয়াই ছিল সঠিক কাজ। আমি জোট সরকারের এই রাজনীতির বিরোধী। এতে দেশের ক্ষতি হবে।

সেই ক্ষতির একটা উদাহরণ আমি দিচ্ছি। এগারোই সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের ইংরেজি পত্রিকা 'ডন'-এ 'ব্লেইম গেইম ইন বাংলাদেশ' নামে ভারতীয় কলামিস্ট কুলদীপ নায়ারের একটি লেখা ছাপা হয়। সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখে ভারতের ডেকান হেরাল্ড পত্রিকায় ২১ আগস্টের পর বাংলাদেশের রাজনীতির ওপর তার 'বিটুইন দ্য লাইনস' কলামে একই লেখা ছাপা হয় তার শিরোনাম হচ্ছে ব্লেম গেইম ইজ অন– দোষারোপের খেলা চলছে। এই দোষারোপের ধরনটা কেমন তার নজির হিসেবে তিনি শেখ হাসিনার সঙ্গে তার কথা উদ্ধৃত করেছেন এভাবে :

Hasina, whom I met first, had no doubt that it was the job of the army which she alleged was against the liberation of Bangladesh. She suspected a deep conspiracy in which the highest in the ruling BNP were involved. She said that Pakistan too had some role to play.

(Dawn:http://www.dawn.com/2004/0911/op.htm#3; Deccan Herald: http://www.deccanherald.com/daccanherald/Sep152004/line.asp//

কুলদীপ নায়ার লিখেছেন, একুশে আগস্টে শেখ হাসিনাকে হত্যার চেষ্টা সম্পর্কে তিনি কিছু এতদিন লেখেননি কারণ তিনি চেয়েছেন আগে তিনি শেখ হাসিনা ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। কুলদীপ শেখ হাসিনার সঙ্গে আগে দেখা করেছেন, শেখ হাসিনা বলেই দিলেন যে এই কাণ্ডটি বাংলাদেশের সেনাবাহিনীই ঘটিয়েছে। ভয়ানক অভিযোগ। কুলদীপ লিখছেন, ব্যাপারটা এমন নয় যে শেখ হাসিনা সন্দেহ করছেন। বরং শেখ হাসিনার কোন সন্দেহই নাই যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। শুধু তাই নয় তিনি এই অভিযোগও করেছেন যে, সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী। ইংরেজি ভাষায় বাক্যগঠনের সুবিধা নিয়ে 'had no doubt that it was the job of the army which she alleged was against the liberation of Bangladesh' বাক্যটিকে আমরা এভাবে বুঝতে পারি যে, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সেই অংশ যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায় না তারাই এই গ্রেনেড ও বোমা হামলা চালিয়েছে। পুরো সেনাবাহিনীকে শেখ হাসিনা হয়তো বলেননি, একটা অংশের কথা বলেছেন। কিন্তু দ্ব্যর্থবোধকতা তবু থেকেই যায়। এখন কুলদীপ নায়ারকেই পরিষ্কার করে বলতে হবে আসলে শেখ হাসিনা কি বলেছিলেন।

সংসদ কার্যকর রাখা মানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকেও জীবন্ত রাখা। সাংসদ সংসদের অধীন। প্রধানমন্ত্রীও। বিরোধী নেত্রীও। প্রধানমন্ত্রী বা বিরোধীদলীয় নেত্রীর দু'জনের কেউই নিশ্চয়ই সংসদ, সংবিধান ও আইনের ঊর্ধ্বে নন। দেশের নাগরিক হিসেবে আমি দাবি করব শেখ হাসিনার সুনির্দিষ্ট অভিযোগ তদন্ত করার দায়িত্ব বর্তমান সরকারের এবং তার এই অভিযোগ যদি সত্য না হয় তাহলে সংবিধান ও আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তোলার জন্য তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আমি তার অভিযোগকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করতে চাই। এই ঘটনা যারা ঘটাতে পারে তারা সেনাবাহিনীতে থাকুক কিংবা স্বর্গে বাস করুক আমাদের বের করতেই হবে।

কিন্তু আমার প্রসঙ্গ আরও গভীরে। এই অভিযোগ একজন ভারতীয় নাগরিককে করা এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকায় ছাপা হওয়া আর জাতীয় সংসদে তোলার মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে। যেহেতু এটা নিছকই অভিযোগ, অর্থাৎ এই অভিযোগ প্রমাণিত নয়, তখন একজন ভারতীয় নাগরিককে বলা আমি নিঃসন্দেহ যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে তখন সেটা দেশ, সার্বভৌমত্ব এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার দিক থেকে অমার্জনীয় অপরাধ হয়ে ওঠে। অথচ একই কথা যখন রাষ্ট্রের সার্বভৌম অবস্থান ও শক্তির জায়গা– অর্থাৎ সংসদ থেকে তোলা হয় তখন সেটা হয় অকুতোভয় দেশপ্রেমের লক্ষণ। তখন এই অভিযোগ তদন্ত করার দায় হয় সংসদের। কোন অবস্থাতেই

সংসদ এই অভিযোগকে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। এই অভিযোগ তদন্ত করা কিংবা দোষীদের ধরা ও শাস্তি দেয়ার ক্ষেত্রে যদি কোন আইনি বাধা থাকে– অবশ্যই নতুন আইনের দ্বারা সংসদ সেই বাধা দূর করতে পারে। যদি সংসদ মনে করে নির্বাহী বিভাগ এই তদন্ত করবে না তাহলে সংসদীয় তদন্ত কমিটি হতে পারে। যদি সংসদ মনে করে নির্বাহী বিভাগ এই তদন্ত করবে না তাহলে সংসদীয় তদন্ত কমিটি তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হতো সংসদের সার্বভৌম এখতিয়ারকে লংঘন করা। অসাংবিধানিক। যেহেতু রাষ্ট্রের নির্বাহী বিভাগ ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে অতএব সংসদ অবশ্যই রাষ্ট্রকে রক্ষা করার সব চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। যদি সেনাবাহিনীর প্রতি সন্দেহ হয় সেনাবাহিনীকে অবশ্যই সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। যদি সংসদের এই সার্বভৌম ক্ষমতা আমরা প্রতিষ্ঠা করতে না পারি তাহলে প্রমাণিত হল নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির কোন ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে আর নাই। আমাদের জন্য তা হবে ভয়াবহ ব্যাপার। দুর্ভাগ্য আমাদের শেখ হাসিনা সংসদে এই কথা বলেননি। বললেন সংসদের বাইরে।

এই বিষয়টি আরও গুরুত্ব পেয়েছে কারণ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বরাতে এই খবর পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই সরকারি সংস্থাটি নিশ্চয়ই এই খবর থেকে ক্ষমতাসীন জোট সরকারের জন্য রাজনৈতিক সুবিধা পেতে চেয়েছে। রাজনীতিতে এটা চলে। যদি রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের কথাবার্তার মধ্যে লাগাম না থাকে তাহলে তার সুযোগ তো অবশ্যই জোট সরকার নেবে। সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির বাইরে শেখ হাসিনার এই আত্মঘাতী মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়েছেন সাবের হোসেন চৌধুরী (দেখুন আজকের কাগজ ২২ সেপ্টেম্বর)। তার দাবি, কুলদীপ নায়ারের কোন লেখায় উল্লেখ নাই যে 'বিরোধীদলীয় নেত্রী সেনাবাহিনীকেই দায়ী করেছেন।' তবে উপরে আমরা সরাসরি কুলদীপ নায়ারের যে ইংরেজি টুকে দিয়েছি তাতে পরিষ্কার যে, অবশ্যই এই ধরনের মন্তব্য করেছেন বলেই তো কুলদীপ নায়ার লিখেছেন। তার লেখায় তো ঘোরপ্যাঁচ নাই। এখন কুলদীপ নায়ারের কথাকে প্যাঁচাতে গিয়ে সাবের হোসেন চৌধুরী খামখা আরও জল ঘোলা করছেন। তিনি শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সচিব। তার অর্থ হচ্ছে শেখ হাসিনাকে সুপরামর্শ দেয়াই তার কাজ। বিশেষত গণমাধ্যমে বা জনসমক্ষে কোন কথা শেখ হাসিনাকে জনপ্রিয় করে আর কোন বক্তব্য তার শত্রুর সংখ্যা বাড়ায় সেই দিকে খেয়াল রাখা, এমনকি কাকে শেখ হাসিনা সাক্ষাৎকার দেবেন আর কাকে দেবেন না সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিশ্লেষণ নখদর্পণে রাখার কাজটিও তার। শেখ হাসিনার বক্তব্য যেন ভুলভাবে কেউ উদ্ধৃতি দিতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে কে? সাবের হোসেন চৌধুরী। তাহলে এই ধরনের বক্তব্য কুলদীপ নায়ারের কাছে গেল কেন? কুলদীপ নায়ার কেন, বাংলাদেশের কোন সাংবাদিক যেন শেখ হাসিনার কাছ থেকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য আদায় করে নিতে না পারে সেটাই তো সাবের হোসেন চৌধুরীর কাজ। চোর পালানোর পর বুদ্ধি দেখিয়ে লাভ নাই। আমি নিশ্চিত কুলদীপ নায়ারের কাছে দেয়া শেখ হাসিনার এই সাক্ষাৎকার বাংলাদেশের রাজনীতির মধ্যে যে মেরুকরণ ঘটাবে সেটা শেখ হাসিনার পক্ষে যাবে না।

সাবের হোসেন চৌধুরী আমার ইস্যু নয়। কুলদীপ নায়ারের কথাকে আমি অযথা কচলাতেও যাব না। বরং আমি শেখ হাসিনার পক্ষে দাঁড়িয়ে বলব যে তাকে তার কথা জাতীয় সংসদে বলতে দেয়া হয়নি বলেই– সংসদে তার অভিযোগ তোলার ন্যায্য অধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন, এটা জেনেই তিনি একজন বিদেশী সাংবাদিকের কাছে সেনাবাহিনীর প্রসঙ্গ তুলতে বাধ্য হয়েছেন। বাংলাদেশের সাংবাদিকদেরও প্রায় একই কথা বলেছেন। আমি জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের প্রতি আচরণের ধরন দেখেছি। এত বড় একটি ঘটনা ঘটবার পর আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে গিয়েছে, কিন্তু সত্যি কথা হল, বিএনপি আওয়ামী লীগকে এই জাতীয় সংকটের সময় ন্যূনতম সহনশীলতা প্রদর্শন করেনি। তাদের কথা বলতে দেয়নি। এটা ঘোরতর অন্যায়।

এটা তো অস্বীকার করে লাভ নাই যে, সেনাবাহিনীর হাতেই শেখ মুজিবুর রহমান এবং তার পরিবারের অন্য সদস্যরা নিহত হয়েছেন। ফলে শেখ হাসিনার ভাষার মধ্যে সেনাবাহিনীর প্রতি ক্ষোভ থাকবেই। খুবই ভাল হতো যদি এই ক্ষোভ যে অরাজনৈতিক এবং তার জন্য ইতিবাচক নয় সেই উপলব্ধি তার মধ্যে জাগত। আওয়ামী লীগের এই সত্যও লুকানোর কোন কারণ নাই যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে তার দল আওয়ামী লীগের একটা বিরোধ আছে। পাকিস্তানি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কুফল বাংলাদেশের জনগণ দেখেছে। তার বিপরীতে আমরা গণমুখী সামরিক চেতনা ও সংস্থা গড়ে তুলতে পারিনি। বড়লোকের ধনসম্পত্তি পাহারার কাজেই তো সব রাজনৈতিক দল সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছে।

যদি সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের স্বার্থের বিরোধ থাকে তাহলে আওয়ামী লীগ কথাটা স্পষ্ট করেই বলুক এবং একই সঙ্গে জাতীয় নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার প্রশ্ন মীমাংসার জন্য তার প্রস্তাব খাড়া করুক। এটাই হবে সঠিক আওয়ামী নীতি। এই বিরোধের রাজনৈতিক ফয়সালা একমাত্র সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতির দ্বারাই সম্ভব।

ভারতীয় আধিপত্যবাদী রাজনীতির ধারা থেকে শেখ হাসিনাকে নীতিগতভাবে সরে আসতে হবে। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের নেত্রী হিসেবে নিজেদের ক্ষমতার ভিত্তি ও ভারকেন্দ্র ঠিক জায়গায় স্থাপন করাই এখন কর্তব্য। তখন সেনাবাহিনীর সমালোচনা জনগণ নেতিবাচকভাবে দেখবে না। ইতিবাচক পর্যালোচনা হিসেবেই গ্রহণ করবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি সেই পথ গ্রহণ করবে?

নব্বই সালের গোড়ার দিকে এই ধরনের একটা চেষ্টা শেখ হাসিনার মধ্যে দেখা গিয়েছিল বলে আমি দাবি করব। এটা আমার বাইরে থেকে অনুমান। হয়তো ঠিক না কিন্তু ২০০০ সালের পর থেকেই আওয়ামী রাজনীতিকে সেই নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের রচনার প্রক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনাটা এত দ্রুত কী করে সম্ভব হল? এটা আমার প্রশ্ন। শেখ হাসিনাও ভাবুন।

আজ লেখা বড় হয়ে যাচ্ছে। আগামী লেখায় সেই কাহিনী তুলব।

৮ আশ্বিন, ১৪১১, শ্যামলী